সমন্বয়

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র

৩০তম সংখ্যা

জৈষ্ঠ ১৪২১ (জুন ২০১৪)

সম্পাদকীয়

সময়ের সমান্তরাল পদক্ষেপে সমন্বয় আরো একটি বছর অতিক্রম করল। নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশনের এই মুখপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এক সুদূর প্রয়াসী প্রেরণা ও আদর্শের হাত ধরে।

প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার এবং পরবর্ত্তী প্রজন্মের সঙ্গে তার পরিচয় এই মুখপত্রের প্রকাশনের মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান সম্পদাকক মণ্ডলী এবং কার্য্যকরী সমিতি সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখার যথেষ্ট যত্নশীল।

পূর্ববর্ত্তী সম্পাদক মণ্ডলী যেভাবে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বর্তমান সম্পাদক মণ্ডলী তার পদক্ষেপ অনুসরণ করে এই মুখপত্রের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নতুন বঙ্গাব্দে সমন্বয়ের নতুন কলেবর তৈরীতে আমরা আগ্রহী। অবশ্য পাঠক কুল এবং আঞ্চলিক বাঙালীর আগ্রহ ও সহায়তা এর পাথেয় এবং পথপ্রদর্শক হবে।

নয়ডা ও পাশ্ববর্ত্তী দিল্লী শহরের সকল বাঙালী ভাষাভাষী এই মুখপত্রের পাঠক হোন এবং সাহিত্য চর্চায় যোগদান করুন এই আমাদের একান্ত আগ্রহ।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নতুন বঙ্গাব্দ সকলের মঙ্গলময় হোক।

নববর্ষ

সুদেষ্ণা রায়

নতুন বছর, নতুন ভাবে, নতুন সাজে, নতুন কাজে,
নতুন আনন্দে, নতুন ভালবাসায়, নতুন সম্ভাবনায়
নতুনের ছোঁয়া দিয়ে যাক তোমার হৃদয়ে.... শুভ হোক নববর্ষ।

চৈত্র শেষ হল গাজন আর চড়কের মেলার আড়ম্বর দিয়ে আর প্রশস্ত হল পরিসর নতুন বছর বৈশাখের। বৈশাখ কথাটি উৎপত্তি হল বিশাখা নামের তারা থেকে। বসন্তের অবসানের সাথে সাথে বৈশাখ আসে তার পশরা নিয়ে অনবদ্য রূপে সজ্জিত হয়ে। পিঙ্গল বর্ণ আকাশ, স্তব্ধ নদী, বাতাসে শুষ্কতা, নীরব দুপুর রাস্তায় ঝরে পড়া শীর্ণ পাতা আর তার মর্মর শব্দ, বিকেলের পড়ন্ত রোদের সাথে সাথে ঝিরঝিরে হাওয়া অবসন্ন দেহতে এনে দেয় প্রাণের সাড়া।

বৈশাখ আসে তার ফুল ও ফলের সম্ভার নিয়ে। কৃষ্ণচূড়ার এক বিশেষ ভুমিকা আছে প্রেমের ইতিহাসে। গ্ল্যাডুলা, পিন্সী, সূর্যমুখীর আকর্ষণীয় রঙ রাঙিয়ে যায় মনকে... বেল, জুঁই এর সুবাস আনে মাদকতা। ফলের রাজা আম, গ্রীষ্মের উপস্থিতিকে করে তোলে আরও মধুর ওর স্বাদ ও গন্ধের দ্বারা। তাই বলে তরমুজ, লিচু কিন্তু পিছিয়ে থাকে না।

সারা বছর সবাই উদগ্রীব হয়ে থাকে গ্রীষ্মের দুই মাস ছুটির জন্য। শুরু হয় নানা জল্পনা, কল্পনা। কোথায় যায় - কোথায় যায়.. মামার বাড়ী যাবার একটা ভীষণ আকর্ষণ বোধ হয় সবাই অনুভব করে। এখন দিন একটু পাল্টছে তাই বাচ্চারা সবাই বিদেশে ভ্রমণে যেতেই বেশী পছন্দ করে।

কথায় আছে বারো মাসে তেরো পার্বণ — তার একটি পার্বণ হয় পয়লা বৈশাখ ... শুরু হয় গণেশ পুজো দিয়ে তারপর একের পর এক উৎসব আসতে থাকে আর আমরা তাতে মাতোয়ারা হয়ে উঠি।

কে. এল সায়গল স্মরণে

সুখেন্দু চ্যাটার্জী

কে. এল সায়গল এক বিস্ময়কর প্রতিভা ঃ

বর্তমান প্রজন্মের কাছে কে. এল সাইগল এক অশ্রুত বা প্রায় অপরিচিত নাম। কিন্তু ষাট বা তদউর্দ্ধ বয়সের সঙ্গীত প্রেমী বা বোদ্ধাদের এটি একটি অবিস্মরণীয় নাম। মর্মস্পর্শী স্নিগ্ধ সুরের যাদুতে আচ্ছন্ন গান — বাবুল মোরা নাইহার ছুটোরি যায়", "প্রীতম আন মিলো, দুখিয়া জিয়া তড়পায়ে" সো যা রাজকুমারী এবং দো নয়না মতবালে হাম পর জুল্ম করে", ইত্যাদি গান অদ্ভুত নস্ট্যালজিক স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। মনের মণিকোঠায় নাড়া দিয়ে যায়।

এই সব কালজয়ী গানের গায়ক হলেন, চল্লিশ দশকের বাঙ্গালীর মনের শিল্পী সুদূর পাঞ্জাব থেকে আগত পাঞ্জাবী যুবক কুন্দন লাল সায়গল।

১৯০৪ সালের ১১ই এপ্রিল জম্মুতে জন্ম কুন্দন লাল (কে.এল) সায়গল ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের প্রথম সুপারস্টার বললে অত্যুক্তি হবে না। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে যখন হিন্দি সিনেমার কেন্দ্র ছিল কলকাতা তখন ১৯৩০ সালে খ্যাতনামা রাগ সঙ্গীতজ্ঞ ও ম্যুজিক ডাইরেক্টর হরিশচন্দ্র বালী সায়গলকে পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন ও তৎকালীন নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীত পরিচালক খ্যাতনামা রাইচাঁদ বড়ালের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এর পরে এই দুই সঙ্গীত সাধকের যুগলবন্দি কলকাতার সঙ্গীত জগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন তোলে যা সঙ্গীতপ্রেমী বাঙ্গালী সমাজে সায়গলের আসন সুদৃঢ় করে তোলে। নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বি.এন. সরকার অবিলম্বে সায়গলকে ২০০৲ টাকার মাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ করে ফেলেন।

প্রবাদ প্রতিম গায়ক পঙ্কজ কুমার মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পাহাড়ী সান্যাল এর সঙ্গে সায়গালের সখ্যতা হয় যা তাঁর সঙ্গীত জীবনের আজীবন পাথেয় হয়ে থাকে।

সায়গলের প্রথম জীবন ছিল আর পাঁচ জনের মত সাধারণ । বাবা অমরচাঁদ সায়গল ছিলেন জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের অধীনে তহশিলদার। সায়গলের মা কেশর বাঈ ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞা ধর্মপ্রাণ মহিলা। তাঁর কাছেই কিশোর কুন্দনলালের (কে.এল) সঙ্গীতের হাতেখড়ি। ভজন, কীর্ত্তন যা ছিল ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে আধারিত তাই দিয়ে তাঁর জীবনে রাগ সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ ও প্রেরণা। শৈশবে তাঁর আকর্ষণ ছিল রামলীলায় সীতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

পিতা মাতার চতুর্থ সন্তান, অর্থ সংস্থানের জন্য বেশী দূর পড়াশুনা করতে পারেন নি। স্কুলের গণ্ডী পার হওয়ার আগে রেলেতে টাইম কিপার হিসাবে কাজ শুরু করেন। পরে রেমিংটন টাইপ কোম্পানীতে যোগ দেন। কার্য্যোপলক্ষে লাহোরে থাকাকালীন শিল্পপতি মেহের চাঁদ জৈনের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন ও আমৃত্যু যোগসুত্র অক্ষয় থাকে। বন্ধু বাৎসল্য সায়গলের জীবনের ছিল প্রিয় অধ্যায়। তাঁর জীবনের কথা যা জানা যায় তাতে সায়গলের মহান মানবিক রূপ ধরা পড়ে। তিনি ছিলেন নিপাট ভদ্রলোক, আত্মভোলা দানশীল, অত্যন্ত দয়ালু করুণাপরায়ণ মানুষ, নিজের বন্ধু বান্ধবদের ব্যাপারে তো বটেই, রাস্তার অপরিচিত গরীব, দুঃস্থ কোন ব্যক্তি তাঁর বদান্যতায় বঞ্চিত হয় নি। তাঁর নিউ থিয়েটার্স থেকে মাস মাইনে অনেক সময় বাড়ী যেতে যেতে অকাতরে চেনা অচেনার মধ্যে বিলোতে বিলোতে শেষ হয়ে যেত। সুফী সন্ত ভাবাপন্ন সায়গল অপরের সুখ দুঃখকে আপন করে নিয়ে সকলের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। কথিত আছে পুনার পথে যাওয়ার সময় ট্রেনে এক ভিখারির দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তাঁর বিবাহের অত্যন্ত মূল্যবান অঙ্গুরীয় দান করে দেন।

অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের মানুষ সায়গল এক অসমীয়া রাজকুমারীর ব্যর্থ প্রেমে প্রথম সুরার নেশায় আবদ্ধ হন। এই সুরাই তাঁর জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে এবং মাত্র ৪২ বছর বয়সে এই মহান শিল্পীর পাঞ্জাবে নিজের পৈত্রিক বাড়ীতে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বের কয়েক বছর বিশেষ করে বম্বেতে থাকার সময়ে সঙ্গীত ও সুরা একে অন্যের দোসর হয়ে গিয়েছিলো। বম্বের রঞ্জিত ফিল্ম স্টুডিয়োতে কাজ করার সময় তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও বম্বের এইচ.এম.ভি. কোম্পানীর সিনিয়র ডিরেক্টরের সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি একথা অস্বীকার করেন যে সায়গল ছিলেন আকণ্ঠ মদ্যপায়ী। অবশ্য গান রেকর্ড করার সময় বহুবার রিহার্সাল দেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব। রিহার্সালের মাঝে মাঝে তিনি অল্প মদ্যপান করতেন এবং যখন মদ্যপানের আবেশে তাঁর সঙ্গীত এক অপূর্ব্ব সুরের মূর্চ্ছনায় আবদ্ধ হয়ে যেত, তখনই ফাইনাল গানের রেকর্ডিং করা হতো।

তাঁর হৃদয় বিদারক মর্মস্পর্শী সুরের উৎস হিসাবে বলা হয় "দুশমন" ছবিতে যেখানে এক মৃত্যু পথযাত্রী টি.বি.তে আক্রান্ত রোগীর কণ্ঠের গান করেন। সেই বিখ্যাত গানটি ছিল "করুঁ কেয়া আস নিরাশ ভয়ি।"

তাঁর এই বিয়োগাত্মক শান্ত সঙ্গীতটি ছিল, তাঁর আগের বিখ্যাত ফিল্ম "পূরণ ভকত" বা "ইহুদি কী লড়কী"র গান যেখানে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ ও রেসোনেন্ট আওয়াজ ছিল গানের বৈশিষ্ট্য। এটা ছিল তাঁর ১৯৩৩ সালের সময়ে গীত গানের ধারা।

১৯৩৫ সালে তাঁর গানের ধারায় বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি 'দেবদাস' যা তাঁকে অমরত্ব দেয় এই সময়ের ছবি। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত শরৎচন্দ্রের দেবদাসে নায়িকা যমুনার সঙ্গে তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। বিভিন্ন সময়ে এই ছবির রিমেক হয় বিভিন্ন নায়ক নায়িকা ও পরিচালক দ্বারা, কিন্তু সময়ের নিরিখে বিমল রায়ের দেবদাসের চেয়ে হয়ত উচ্চতর স্থানের অধিকারী ছিল, প্রমথেশ বড়ুয়া, সায়গলের দেবদাস। এই চলচিত্রের গান 'বালম আয়ে বসো মোরে মনমে' ও 'দুখকে অব দিন বিততে নাহী" সারা ভারতে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

পরবর্তী কালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় সায়গল বেশ কয়েকটি অভিনয় করেন। তার মধ্যে ১৯৩৭ সালে অভিনিত "দিদি' (বাংলা), প্রেসিডেন্ট (হিন্দি) ১৯৩৮ সালে অভিনিত বাংলা ছবি "সাথী" ও "হিন্দি ছবি "স্ট্রিট সিঙ্গার" এবং ১৯৪০-এর ছবি 'জিন্দগী' (হিন্দি) সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সমাদৃত হয়। এর মধ্যে "বাবুল মোরা নাইহার ছুটোরি যায়' গানটি যা স্ট্রিট সিঙ্গারে' সাইগল ক্যামেরার সামনে গেয়েছিলেন, বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এরপর তিনি বম্বে পাড়ী দেন, ১৯৪২ ও ৪৩ এ রঞ্জিত মুভিটোনের প্রযোজিত ছবি 'ভক্ত সুরদাস' ও 'তানসেন' প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে, তানসেনের বিখ্যাত সঙ্গীত "দিয়া জ্বালাও, জগমগ জগমগ" দীপক রাগে আশ্রিত সত্যই কালজয়ী।

কলকাতায় তিনি ফেরেন ১৯৪৪-এ। নিউ থিয়েটার্সের 'মেরি বহন' ছবিতে দুটি গান সারা ভারতের মন জয় করে নেয়। "দো নয়না মতবারে, হম পর জুল্ম করে" ও ঐ কাতীবে তকদীর মুঝে ইতনা বতা দে, কেঁও মুঝসে খফা হ্যা তু কয়া মৈনে কিয়া হ্যায়"।

১৯৪৬এ তাঁর নিবেদন ছিল বম্বে থেকে 'শাহজাহান' ও 'পরওয়ানা' তাঁর মৃত্যুর (১৮ জানুয়ারী, ১৯৪৭ বয়স ৪২) পর রিলিজ হয়। এর চারটি গান যা খয়াজা খুরশীল আনোয়ার এর পরিচালনায় গীত হয়, 'টুট গয়ে সব সপনে মেরে', মোহব্বত মে কভী এইসি ভি হালাত". "জীনে কা ঢঙ্গ শিখায়ে যা', 'কঁহী উলঝ না জানা" তাঁর জীবনের শেষ অবদান।

পনের বছরের চলচিত্র সঙ্গীত জীবনে সায়গল মোট ২৮টি হিন্দি, সাতটি বাংলা ও একটি তামিল ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁর মোট গানের সংখ্যা ১৮৫ যার মধ্যে ৪৩টি গীত ফিল্মের বহির্ভূত।

সায়গলের বাংলা গানের সম্ভারও অবিস্মরণীয়। অবাঙ্গালী গায়ক হিসাবে তাঁর রবীন্দ্র সঙ্গীত ও মন্ত্রমুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনে তাঁকে রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড করতে অনুমতি দেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয় - "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান"। "এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার", "একটুকু ছোঁয়া লাগে", "আজি খেলা ভাঙ্গার খেলা", "আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে" ইত্যাদি।

"আমাদের জাতীয় জীবন অতীত কালে মহৎ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের ভবিষ্যত আরও গৌরবান্বিত"

স্বামী বিবেকানন্দ

ঁমাষ্টারদা, ঁঅনন্ত সিং, ঁজ্যোতিষ জোয়ারদার ও ঁধরণী কান্ত রায় - শ্রদ্ধার্ঘ

ডঃ মৃণাল কান্তি রায়

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী সূর্য্য সেন - মাষ্টারদাকে মৃত অবস্থায় বঙ্গোপসাগরের অতল গহনে জলজ প্রাণীর খাদ্য বানিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল বৃটিশ রাজ। এরপরই সশস্ত্র বিপ্লববাদের যুগ, অগ্নিযুগের পরিসমাপ্তি হয়। (সুনীল, ২০১২)। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সুবাদ হয়েছিল ১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রিল। জালালাবাদে সম্মুখ সমরে বারোজন হয়েছিলেন শহীদ। মাষ্টারদার দলের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল প্রমুখরা। জালালাবাদ সংঘর্ষের পর অনন্ত সিং, জেনারেল গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল চট্টগ্রাম ছেড়ে ছড়িয়ে পরবার জন্য রওনা হলেন কলকাতার দিকে - পথে পুঁচিয়ারি রেলস্টেশনে অনন্ত সিংদের সাথে পুলিশের গুলির লড়াই একটি চমকপ্রদ ঘটনা। এসব অনেকেই হয়ত অবগত আছেন। বিশেষ করে প্রবীণরা।

অনন্ত সিং

জনশ্রুতি ছিল অনন্ত সিং ছিলেন একজন রূপকথার নায়ক। বহু গল্প কাহিনীই প্রচলিত ছিল তাকে নিয়ে - তিনি নাকি ছিলেন ডাকাত? দরকার হলে শুধু হাত নয়, পা চোখ, কান এসব দিয়েও রিভলবার চালাতে পারতেন - কত গল্প কথা, কত কাহিনী (৪, ২০১০) তবে সবই গল্প ছিল না,. সত্যও গোপন ছিল এ সব কথায়। বিপ্লববাদের নেতারা জেলের বাইরে থাকলে সরকারের নিদ্রা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। কিন্তু অঘটন ঘটলো ১৯৩০ সালের ২৮শে জুন।

অনন্ত সিং-এর আত্মসমর্পণ

এদিন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান Loman কে চিঠিতে লিখলেন "আমি আত্মসমর্পণ করছি না - এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়।"

ঐ সময় অনেক ছেলেরা ছাত্র-জীবন বিপন্ন করে দেশের জন্য আত্মত্যাগ, বিসর্জন, গুলি খেয়ে জেলে গিয়ে ও ফাঁসিতে ঝুলে ইত্যাদি দ্বারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে। এই অবস্থায় প্রথম শ্রেণীর নেতা অনন্ত সিং ধরা দিলেন কেন? ব্যক্তিগত ব্যাপার — তাই এখানেই শেষ। ওদিকে মামলা রুজু হয়েছে — আসামী বত্রিশ জন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং প্রমুখরা। অনন্ত সিং-এর পিতা গোলাপ সিংও কাঠগড়ায়।

সিং মশায়ের আত্মসমর্পন খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। জেলবন্দী বিপ্বীরা অনন্তদাকে কাছে পেয়ে তাদের মুখে শোনা যায় উল্টো কথা - তারা স্বেচ্ছায় দেয়নি স্বীকারোক্তি। এই জবানবন্দী পাল্টানো এক অসম্ভবকে সম্ভব করার পিছনে ছিল অনন্ত সিং-এর কৃতিত্ব, তাঁর আত্মসমর্পণ।

ঁধরণী কান্ত রায় -সংগ্রামী

১৯৩০-১৯৩১ সালের ঘটনা। লেখকের পরলোকগত পিতা শ্রদ্ধেয় ধরণী কান্ত রায় ময়মন সিংহ জেলার গ্রাম কুরাটি ও একটি ছোট্ট গঞ্জ খালবলা বাজারের নিবাসী। I.Sc. একবারে পাশ করতে পারেন নি। কিন্তু পরের বছর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এ কেমন করে সম্ভব? প্রথম বারে অনুত্তীর্ণ। পরের বারে প্রথম বিভাগ, মনে হয় চমকপ্রদ। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল সত্যি ঘটনা।

পিতার সহপাঠী

বাবার সহপাঠি মতিলাল সাহা, দুজনের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। মতি কাকা ঠিক করেন তিনি কলকাতায় পুরো ডাক্তার হতে আসতে চান না - আধা ডাক্তারি, ডিপ্লোমা, LMF-তে সন্তুষ্ট, তাই ভর্ত্তি হন ঢাকার কলেজে।

আঠার বাড়ি

ঐ গ্রাম গঞ্জে ট্রেনে যেতে হলে নামতে হত আঠার বাড়ী স্টেশনে। ঐ আঠার বাড়ীর রাজা ছিলেন মহিম রায়। ঐ রাজাদের কোলকাতার বাড়ির নাম "আঠার বাড়ি হাউস" যেটি এখনও আছে, রূপচান্দ মুখার্জী লেনে ঠিক ভবানীপুর থানার পিছনে, খুব সম্ভবত বিজলী সিনেমা হলের কাছে। ঐ রাজা বাবাকে খুব স্নেহ

করতেন, ডেকে পাঠাতেন কারন উনি সংগ্রামী ছিলেন, জেল খেটেছেন বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে ১৯৩১-৩২ সালে। এই কারাবাসই ঘটিয়েছিল, ওর জীবনে দুর্যোগ, ছাত্রজীবনের সর্বনাশ। যা ঘটেছিল লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে, ঐ অগ্নিযুগে।

জ্যোতিষ জোয়ারদার

ঐ অগ্নিযুগের সমাপ্তির পর সবাই এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীজীর ছত্রছায়ায়। আমার বাবা যোগ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার একজন প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত জ্যোতিষ জোয়ারদারের দলে। বাবা ছিলেন ঐ দলের আঠার বাড়ীর সাধারণ সম্পাদক, তা ছাড়াও ছিলেন অন্যান্য পদে যেমন আঠার বাড়ী হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, Union Board-এ সদস্য।

১৯৪৫/৪৬ সালের ঘটনা, ভারত স্বাধীন হবে হবে। জোয়ারদার মশাই বাবাকে বল্লেন ধরনী আমি কিছু বলবো জনসাধারণকে, তুমি একটি জনসভা ডাক পরশুদিন। মাত্র দুদিন সময় । বাবা বলেন এত কম সময়ে কি করে করবো ? না, না তুমি পারবে। সেই জনসভা হয় ঐ রাজার শিব মন্দিরের সামনের মাঠে ঐ খালবলা গঞ্জে - দশহাজার জনতার সমাবেশ হয়েছিল। তখন লেখকের বয়স ৭/৮ বছর।

১৯৩১-৩২ সালের ঘটনা

আমার পিতৃদেব কলকাতায় দুই বছর কোলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় অনন্ত সিং মশায়ের দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়লে, পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পরওয়ানার খবর অনন্ত সিং পেয়েছেন। একদিন দুপুরে থেকে বলেছেন পিতৃদেব, তখন সিং মশায় নির্দেশ দেন, ধরনী শীগগির পালিয়ে যাও। বাবা বলেন না পালিয়ে যাবো না, কারণ ওঁর সংগ্রামের মূল চিন্তন, মনন ও প্রাণন ছিল - Do or Die। ফলে কারাবাস করতে হয় বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে। ওঁর কোষ্ঠিতে ছিল দুবার জেলে যাবেন। সময়টা লেখা ছিল না। ঐ কারাবরণ নিয়ে আমার সঙ্গে বাবার বাকযুদ্ধ হ'ত। আমার বক্তব্য ছিল ডাক্তার হওয়া যখন হ'ল না তখন সংগ্রামের পথে রাজনীতিতে থাকলে কিছু অগ্রগতি নিশ্চয়ই হ'ত ঐ পেশায়। প্রথমবার জেলবাস তো হয়ে গেছে - দ্বিতীয়টি কখন হবে। তা ঘটে ছিল ১৯৫৯-এ পশ্চিম পাকিস্তানে আয়ুব খার শাসনকালে - কারণ আমরা তখন বহরমপুরে মাথা গুজবার একটা বাসাবাড়ি করেছিলাম, টাকা পেলেন কোথা থেকে ? আমি সেই সালে কল্যাণীতে স্নাতকের ছাত্র। একেই বলে অখণ্ডীয় ললাট লিখন।

উপরোক্ত মতি কাকা কিন্তু LMF ডাক্তার হয়ে সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ি বাড়ি যেতেন, তা ছাড়া নিজের বাড়িতেও ডাক্তারখানা ছিল। মতিকাকুর ছেলের সঙ্গে আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল - স্কুল জীবন থেকেই উনি বলতেন তোর মেয়ের সঙ্গে আমার বড় ছেলের বিয়ে দেবো - সে হ'ল ১৯৪০/৫০ দশকের কথা। সে বিয়ে হয়েছিল ১৯৫৯/৬০ সালে। ১৯৭১ সালে খান সেনারা যখন এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করছিল তখন মতিকাকুও সেই লাইনে দাঁড়ান। তবে একজন অফিসার বলেন ঐ ডাক্তারটাকে ছেড়ে দে - ও বিনা পয়সার অনেক সময় গরীবদের চিকিৎসা করে। উনি বাংলাদেশ ছাড়ে নি, শেষ নিশ্বাস ওখানেই ত্যাগ করেছেন।

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত জীবনের খেলা

১৯৬২ সালে হ'ল বর্তমান বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যার ফল স্বরূপ পিতৃদেব ধরণী রায়কে লেখক, যিনি তখন Ph.D করতে ঢুকেছেন দিল্লীর পুসা ইনস্টিটিউট আর ফিরে যেতে দেন নি - তার ফলে তাঁর জীবনের দারিদ্র্যের খেলা চলেছিল শেষ নিঃশ্বাস ফেলার পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত। জীবনের এই রূঢ় বাস্তবরূপ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। ভাগ্যের এই পরিহাস করা তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে হয়ত উচিত কিন্তু বাস্তব জীবনে সম্ভব হয় না। মনে প্রশ্ন ওঠে ও সব লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য কি একই সূত্রে বাঁধা ছিল ? যদি তাই হয় তবে কেন হয়েছিল ? এই প্রতিবেদন থাকলো জীবন দেবতার কাছে- উত্তর হয়ত মিলবে না ! দেহ মন ইত্যাদি ভোগায়তনই থাকবে। আত্মা তো স্বরূপগত পরমা — যিনি থাকেন নিষ্ক্রিয় — অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেন। আত্মাতো অজড়, অমর। তাই আমরা বেচে আছি — শরীর চলে গেছে।

(নির্বাচিত তথ্যগ্রন্থ
অগ্নিপুত্র - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আমি সুভাষ বলছি - শৈলেশ দে)

শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাই যে আমাদের সঙ্ঘের সদস্য শ্রীযুক্ত প্রভাকর ঘোষ মহাশয় ৩৪ সেক্টর নিবাসী গত ২৫শে এপ্রিল, শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় আমাদের ছেড়ে অমৃতধামে যাত্রা করেছেন। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।

ভোকাট্টা

মহুয়া পাল

ভোকাট্টা এক ঘুড়ি,
আপন মনে পালটি খেয়ে
দেয় আকাশে পাড়ি,
নেই ঠিকানা
করে বাহানা
আর যদি না ফিরি।।

রঙটি তাহার বেশ বাহারে,
ছেলে বুড়োর নজর কাড়ে।
খোলা হাওয়ার পেখম মেলে
সাঁতরে ফেরে।

দেখে যেজন, এজন, সেজন,
রূপের বাহার-আহা মরি!
যায় আকাশে, নীল বাতাসে
ভাসায় নিজের স্বপ্নতরী।।

অনেক কালের বাঁধন ছিঁড়ে,
যায় সে ছেড়ে লাটাই টারে
স্বাধীন ঘুড়ি, চলল উড়ি
ধরতে তারে কে আর পারে?

বন জঙ্গল, শহর নদী,
কত শত বাড়ি গাড়ি-
যায় পেরিয়ে, দিক হারিয়ে,
সবার সাথে যেন আড়ি।
মনের সুখে চলল সে যে

আজ এখানে, কাল ওখানে,
দুষ্টু ছেলের হাত এড়িয়ে
আর ঘুড়িদের মন জ্বালিয়ে,
বিদেশ পানে।।

হঠাৎ কালো মেঘ
ফেলল আকাশ ঢেকে
হানল আঘাত বিদ্যুতে,
দমকা হাওয়ার একটানে
পড়ল গিয়ে কাশবনে
ভয় যে তার দৃষ্টিতে।।

সুতোর ফাঁদে, জড়িয়ে কাঁদে
ভুল হয়েছে ভারি,
চৌকো ঘুড়ি বায়না ধরে
ফিরতে চায় সে বাড়ী।।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

শ্রাবণী ঊষা

তরুণ চক্রবর্তী

ভোরের বহা নদীর জলে স্নানটি সেরে নিয়ে,
বৃষ্টিভেজা এলোচুলে এসে হাসি মুখে।
ভোর হয়েছে বললে তুমি, দেখল সবাই প্রকাশ,
যদিও সবাই জেগে ছিল, মনে রাতের আভাস।।
'ভোর হয়েছে, মিটিয়ে ফেল সকল প্রাণের কালি,
সবাই মিলে সাজিয়ে ধরো, সবুজ প্রাণের ডালি।
বাজিয়ে বাঁশি, মিলিয়ে সুর ধরো হাতে হাতে।
গাওগো সবাই নবীন গান সকল হাটে বাটে।।

ধব সুর

সনৎ চক্রবর্তী

ভাষায় গান লিখতে থাকি,
সুর আসে না মনে।
তোমার সুর দাও তাহাতে,
হৃদয় ভরুক তানে।
ভুবন জুড়ে বাজবে সুর,
সকল হৃদয় মাঝে।
সেই সুরেতে সুর মিলিয়ে
চলবে সবাই কাজে।।
জীবন ভরা সেই যে কাজ,
তোমার তবে ধব।
ক্ষণেক সারা হলে সে কাজ,
সাধন হবে তব।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

হঠাৎ তোমায় পড়ল মনে

অমল বৈরাগী

হঠাৎ তোমায় পড়ল মনে
কবিতা লেখার ছলে।
যদিও সময় পিছিয়ে গেছে
জোয়ার ভাঁটার জলে।
আমি তখন সদ্য যুবক,
তুমি শুধু প্রিয়া।
ভাবলে তোমায় উঠত দুলে
অবুঝ সবুজ হিয়া।
আজকে তোমার নাইকো মনে,
যে দিনের সে স্বপ্ন।
ভুলে থাকো, নীরব থাকুক
মধুর দিনের লগ্ন।।
বিস্মৃতির অগাধ জলে, হারিয়ে আছ তুমি
আছে কেবল স্মৃতি ভেজা আমার মর্মভূমি।

আপনি কি জানেন ?

এমন অনেক মজাদার ঘটনা আছে যা শুনলে হয়তো আমরা নিজেরাই আশ্চর্য হয়ে যাব, নিজের মনেই বলব - 'তাই কি? এমনই কিছু ছোট ছোট ঘটনা সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করার জন্য এই বিভাগটি খোলা হল। যদি পাঠকদের ভাল লাগে তবে আমাদের অনুরোধ থাকবে আপনারও এইরকম কিছু অজানা বিষয় জানতে সক্রিয়ভাবে এই বিভাগে অংশগ্রহণ করুন।

আজকের অজানা প্রশ্নমালা ?

১. ইতিহাস বিখ্যাত ইউরোপের ইঙ্গ ফরাসী যুদ্ধ জানা যায় ১০০ বছর ধরে চলেছিল, কিন্তু জানেন কি ঠিক কত বছর এই যুদ্ধ চলেছিল ?

২. প্রশান্ত মহাসাগরে কামারি দ্বীপপুঞ্জ কোন জন্তুর নামে রাখা হয় ?

৩. রাশিয়ানরা 'অক্টোবর বিপ্লব' কোন মাসে উদ্‌যাপন করে ?

৪. চীনা গুজবেরী কোন দেশ থেকে এসেছে ?

৫. 'Black Box' করাটা আমরা কোনো উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার সময় প্রায়শই শোনা যায়। এটা কি জানেন ? এই Black Box এর আসল রঙটা কি ?

৬. ভারতীয় কোনো ফুটবল ক্লাব কোন বছরে প্রথম I.F.A. Shield জয় করে ? এবং তারা কাকে final-এ পরাজিত করে।

৭. ক্রিকেটাররা মাঠে 'Panama Hat' ব্যবহার করে। এটা কি জানেন এই কথাটি কোন দেশ থেকে এসেছে ?

৮. বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট কলকাতায় একটি অতি পরিচিত রাস্তা। এই রাস্তাটির আদি নামটি কি জানেন ?

৯. গ্রীক স্থাপত্যে নির্মীত কলকাতায় গঙ্গার পাড়ে বাবুঘাট একটি প্রাচীনতম ঘাট। এই ঘাটটির আদিনাম কি ছিল জানেন ?

১০. কলকাতার আমর্হাষ্ট স্ট্রীট রাস্তাটির পুরোনো নাম কি ?

উত্তর ৯ ও ১০ এর পাতায়

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা

বিপ্লব দাশগুপ্ত

'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা কি জাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে যায় মাঝির তানে...' নিজেকে গর্বিত মনে করছি বাঙালি বলে। বিশ্বের সম্মান নিয়ে এসেছে আমাদের বাংলাভাষায় রচিত গান আমরা জানি যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা 'জনগণমন' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত আবার তাঁরই রচনা, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'- বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত । আমরা কি জানি কবিগুরুর রচিত আর একটি বাংলা গান সিংহলি ভাষায় অনুদিত হয়ে শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত ! আজ এই বিষয়ে কিছু জানাবার ধৃষ্টতা রাখছি।

শ্রীলঙ্কার বাসিন্দা আনন্দ সমরকুন শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের কাছে কলা ও সঙ্গীত বিভাগে পড়তে এসেছিলেন, তিনি ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে পাঠগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে আনন্দ গুরুদেবের কাছে শ্রীলঙ্কার জন্য একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রের অনুরোধে বাংলায় একটি সঙ্গীত লিখে তাঁর হাতে দেন। আনন্দ সমরকুণ রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা, কবিতা, গল্প ও উপন্যাস সিংহলি ভাষায় অনুবাদ করে জন সমাদৃত হন। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলাগানটি আনন্দের হাতে দিয়েছিলেন তার প্রথম লাইনে আছে 'শ্রীলঙ্কা মাতা...' পরবর্তীকালে গানটির কথা কিছু ওলট পালট করা হয়।

1940 সালে আনন্দ সমরকুন এই গানটি সিংহলি ভাষায় অনুবাদ করেন। ওই সময় শ্রীলঙ্কা ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের অঙ্গ ছিল। শ্রীলঙ্কার মানুষদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংহতির উদ্দীপনায় গানটি রচিত হয়েছিল। তিন বছর ধরে গানটি বহুলভাবে শ্রীলঙ্কার গ্রামে গঞ্জে গীত হয় এবং জনসমাহত হয়। এরপর শ্রীলঙ্কা স্বাধীন হবার পর এই গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিগণিত হয় এবং ১৯৫২ সালে শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতা দিবসে সমবেতভাবে গীত হয়। জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে এই গানটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় একটি কমিটির মাধ্যমে যার পরিচালক হিসাবে ছিলেন Sir Edwin Wijeyerafne. গানটির প্রথম লাইনটি ছিল 'নমো নমো মাতা, আপা শ্রীলঙ্কা...' গানটি রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া সুরে গীত হয়।

মন্মথবাবু ও তার দিনলিপি

জে.এল. পাণ্ডা

মন্মথবাবু প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই। দীর্ঘ ও মেদহীন শরীর - বেশ কিছুদিন আগে তপতী মানে ওনার স্ত্রী মারা গেছেন। মন্মথবাবুর এক পুত্র ও এক কন্যা, দুজনেই প্রবাসী। মন্মথবাবু থাকেন নিজের বাড়ীতে কলকাতা শহরতলীতে। পুত্র কন্যার সঙ্গে প্রতিদিন কিছু কথা বলে দিনের কিছু সময় কাটে। নিজে ইংলিশের প্রফেসর ছিলেন। কবিতা দর্শনের বইপত্র ঘেঁটে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সঙ্গী তার বিধবা বোন। দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই। রুচিবান মানুষ। সত্যান্বেষী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন। অনেক সংগ্রহ। বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তার মধ্যে সাহিত্য ও দর্শন পুরোভাগে কিন্তু তিনি বিজ্ঞান মনস্কও। মাঝে মাঝে তিনি উদাত্ত স্বরে Keats, Shelly, Byron ইত্যাদি আবৃত্তি করেন। কোন সময় দেখা যাবে গুণগুণ স্বরে রামপ্রসাদী গাইছেন। বুদ্ধিজীবির যেমন কাটে. তেমনই মন্মথবাবুও কাটে মাটির সঙ্গে, যোগাযোগ আছে - বাগানে ফুল ফোটান - বিভিন্ন মরশুমী ফুল ফোটে তার বাগানে। মাঝে মাঝে মন্মথ বাবু চলে যান তার পৈতৃক ভিটায়, পূর্বপুরুষের লাগানো গাছ গাছালির খবর রাখেন - তারা কাটা গেল কি বেঁচে আছে। মাটি ও পাতার গন্ধ শুঁকে থাকেন। তুলনা করেন শহুরে সভ্যতার সঙ্গে যেখানে মানুষ সুখের ভান করে কিন্তু সুখ পায় না। আত্মকেন্দ্রিকতা যেখানে প্রধান সেখানে সুখের কথা ভাবা অলীক। তিনি যেখানে থাকেন সেখানে সবাই বাঁচার চেষ্টা করে কিন্তু বাঁচে না - এ এক চরম পরিহাস।

Burtrand Russel এর কথা মনে পড়ে মন্মথবাবুর - সুখ পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। যত সম্পৃক্ত পারিবারিক সম্পর্ক ততই সুখ। কবিরা অন্য কথা বলেন —

সুখের কথা বলো না আর
সুখের কথা কেবল ফাঁকি
দুঃখে আছি, আছি ভালো
দুঃখে আমি ভালো থাকি।।

এই রকম চলা তার জীবনে - পিছন ফিরে দেখলে তার সুখের কথা ঐ উপরের কবির কথাই, সুখের পিছনে তিনি ছোটেন নি। অসীম ধৈর্য্য সহকারে সব অবজ্ঞা সহ্য করেছেন। ছোটো ছোটো অবজ্ঞা মন্মথবাবুকে স্পর্শ করেনি। তার জীবন বোধকে পরিবর্তনের ছোঁয়ায় নিয়ে যেতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ কবিতায় বলেছেন

সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে পেতেছ সরল জীবনে...
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এই ভাবনায় ভাবিত মন্মথবাবুর জীবনে কোন ছায়া ফেলতে পারেনি।

এই আপাত বৈরাগী, ভগবত ভাবনায় সমর্পিত প্রাণ মন্মথবাবুর ডায়েরী খুলে কিছু তার লেখা সংগ্রহ করেছিলাম - তাই তুলে ধরলাম পরের পাতাগুলিতে। এগুলি যেমন বৈচিত্র্যে সম্পদশালী তেমনি আমাদের কাছেও বরণীয় হতে পারে।

আমার কাছে সত্য মানুষের মন ও তার বিকাশ। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ঈশ্বর সাধনার পথ। অনেক বিকার নিয়ে জীবন কাটিয়েছি, সবই আমার চলার পথে এসেছে - ভালোবাসা, প্রেম, হিংসা ও অবজ্ঞা। আজও আমার সবকিছু আমার কাছে ঘোলাটে মনে হয় - যে সত্যনিষ্ঠ জীবন আরম্ভ করেছিলাম তা অনেক কামনা বাসনায় বিবিক্ত।

মানুষকে দেখতে সাধ হয়েছে - আন্তরিক ভাবে মিশেছি - মিশে দেখেছি তার কদর্য্য দিক। চরিত্রের মলিনতা। আমি তোমাদের সবাইকে ভালবেসেছিলাম কিন্তু তোমারা আমাকে ভালবাসনি, তাই বলি পৃথিবীতে ভালবাসার লোক কম। সবাই চলে যেতে চায় আমার দুঃখকে পিছনে ফেলে - এটাই সংসারের নিয়ম। পাওয়ার জন্য সব সময় দিতে হয়। দিতে দিতে নিঃস্ব হয়ে গেলে সংসার তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

যে চেতনার কথা আমরা বার বার বলেছি রামপ্রসাদী গানে মা কালীকে চৈতন্যময়ী বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ "আমি" কবিতায় বলেছেন ঃ

আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনী উঠলো রাঙা হয়ে।

আর একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্নজালে।

"হে মানুষ, কোন জড় বস্তু থেকে এল চৈতন্যর পবন? ভালবাসা? মুগ্ধতা? কে ব্যাখ্যা করবে তা? বিজ্ঞান তো অন্ধের যষ্টি মাত্র। পথের ঠাহর দেয়, কিন্তু সে তো নয় চোখ। বীজের ভিতরে বটবৃক্ষের সম্ভাবনা - এ কি ভাবতে পারা যায়? একটু ভাবো। ভালো করে ভাবো। ঈশ্বরীয় বা নিরীশ্বর যাই হও তুমি, দাঁড়াও দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রার্থনা করো জ্ঞানবান করো আমাকে। সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় অবগুণ্ঠন সরিয়ে দাও, বুঝতে দাও আমি কে", উদ্ধৃতি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "পার্থিব" উপন্যাস থেকে। এরপর তিনি চলে গেছেন সংসারে থাকতে হলে কি করতে হবে তার কথায় —

"সংসার দীর্ঘ রোগস্য সুবিচার মহৌষধাম
কোহহং কস্য চ সংসারো বিবেকন বিলীয়তে"।

আমি কে, কার এই সংসার বন্ধন। এই দৃঢ় বিচারই সংসার রূপ দীর্ঘ রোগের মহৌষধ। কারণ - বিচারই একমাত্র পথ। সংসার ভ্রান্তি দূর করতে হলে বিচার চাই।

নিজেকে জানতে হলে মনের সব জানালা খুলে দিতে হবে। মুক্ত নীলাকাশে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো তবেই আত্মজ্ঞান -Lao Tzu-এর ভাষায়, knowking others is intelligence, knowing yourself is true wisdom, mastering others is strength, mastering yourself is the power.

কি ভাবে চালাবো নিজেকে বুঝতে পারিনি - মুক্তির স্বাদ পাওয়ার ইচ্ছা কোনদিন হয়নি.. হঠাৎ করে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা মনে পড়ে গেল।

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ"।

পৃথিবীর মানুষ যেখানে বসবাস করে সেই জায়গাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে না। পৃথিবীকে বাস করার অযোগ্য করে তুলেছে - তার মূল্য বোধ পারস্পারিক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে - আমাদের পাঁচ হাজার বছরের জ্ঞানগম্যিকে উপহাস করে পাশ্চাত্য অনুপ্রেরিত দর্শন ও ভাবনাকে গ্রহণ করেছে। এগুলি কেউ বুঝতে চায় না - পৃথিবীতে এখন বড় অসুখ।

এরপর মন্মথবাবুর জীবন বড়ই অন্যধারায় বয়েছে - কোন সময় তিনি স্বপ্নাছন্ন, কোন সময় বিহ্বলতা ওনাকে পেয়ে বসেছে - বড় বিষণ্ণ বড় বেদনাময় শেষ দিকের দিনলিপি।

এত রোগ, এত ব্যথা বেদনা দিয়ে কেন তুমি ছেড়ে গেছো তপতী - তোমাকে ভালবাসার কোন কার্পণ্য রাখিনি - তোমার কোন আবদার পূরণ করিনি মনে পড়ে না। কোনদিন তোমার রূপ নিয়ে কথা বলিনি যখনই তোমার রূপের কথা ভেবেছি তখনই ওমর খৈয়াম সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অকপটে যে বাসিল ভালো,
সে দেখে কি প্রেয়সী তার রূপসী কি কালো।

আজকের রাত্রি আমার শেষ রাত্রি হোক, এই বর্ষণ মুখর অন্ধকার রাত্রি শেষ করে দিক এই অর্ধেক জীবন - কোন ইনিংস ঠিক করে খেলতে পারিনি - পারিনি জীবনকে সাজাতে, উপভোগ করতে। কোন প্রেমাতুর নারীকে বাড়িয়ে দিই নি প্রেমের হাত - স্পর্শ করনি তার দেহ, বার বার মনে হয়েছে এতো তপতীর প্রতি অন্য কিন্তু আজ মনে হয় সব ভেসে গেছে - অতীতের গর্ভে - আমি আজ বলতে পারব না

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক
চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমার দু দণ্ড শান্তি দিয়েছিল
নাটোরের বনলতা সেন।

আমার জীবন স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে, বিলীন হয়ে যাবে তারা ভরা আকাশে অথবা আগুন ঝরা গ্রীষ্মের দুপুরে অথবা নীলিমার ওপারে সূর্যাস্তের দেশে - আমি বলে উঠবো আমাকে তো কেউ দেখলে না - দেখার ইচ্ছাও হল না। রবীন্দ্রনাথের মতো করে বলি

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে,
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

এরপর আর কোন লেখা নেই, কিছু হিজিবিজি কাটা আছে।

****

এবার উত্তরগুলো জেনে নিন **(৭ এর পাতার পর)**

১. ১১৬ বছর । ২. কুকুর । ৩. নভেম্বর মাস

৪. নিউজিল্যাণ্ড । ৫. কমলা রঙ ।

৬. ১৯১১ সালে মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব ইষ্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট ফুটবল ক্লাবকে ফাইনালে পরাজিত করে প্রথম ভারতীয় ফুটল ক্লাব IFA Shield জয় লাভ করে।

৭. 'Panama Hat' কথাটি দক্ষিণ আমেরিকার ইকুইয়েডর দেশ থেকে এসেছে এই টুপি সেখানেই বানানো হয়।

৮. এই রাস্তাটির পুরোনো নাম ছিল 'কসাইতলা স্ট্রীট'। কারণ এই রাস্তার উপর গরু-ছাগল কাটা হত। আর কসাইরা এখানে থাকত। এটা খুব খারাপ রাস্তা ছিল।

৯. ১৮৩০ সালে এই ঘাটটি নির্মিত হয়। এই ঘাটটির আদি নাম ছিল 'বাবু রাজচন্দ্র দাস ঘাট' ইনি ছিলেন জানবাজারের জমিদার এবং সবার শ্রদ্ধেয় রানী রাসমণির স্বামী।

১০. এই রাস্তাটির আদি নাম ছিল 'Alms House Street', ভিখারীদের রাস্তা। বাঙ্গালি ব্যবসায়ী মতিলাল শীল এখানে ভিখারীদের বসবাসের জন্য 'Alm House' বাড়িটি নির্মাণ করেন। এখানে প্রতিদিন প্রায় পাঁচশো ভিখিরিকে খাওয়ানো হত। এই রাস্তাতেই রাজা রামমোহন রায় থাকতেন। বর্তমানে তাঁরই নামে রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে।

* * * * * *

দাদার সাদা ভূত দেখা (ছোট গল্প)

শ্রী মধুসূদন ভট্টাচার্য

এক গ্রীষ্ম রাতে আমি ও আমার সেজদা ঋষভ (শ্রেষ্ঠজন) শুয়েছিলাম আমার বাল্যবন্ধু অজয়দের তিনতলা বড় বাড়ির নীচের তলায় লম্বা লাল বারান্দায় বিছানা পেতে। আমরা অজয়দের ভাড়াটে।

বড়লোক বন্ধু। যৌথ পরিবারভুক্ত। বাবা-মা পিসতুতো - মাসতুতো ভাইবোন সহ গরমের ছুটিতে তাদের নিজস্ব গ্রামের বাড়ি শান্তিপুরে বসবাস করতে গেছেন।

দাদু দিদিমা ও এক পিসেমশাই বছর দেড়েকের মধ্যে মারা গেছেন। ওনাদের মানসিক অবস্থা বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত। তাই স্থান পরিবর্তনে পরিবেদনা ঘোচাবার প্রয়াস।

আমাদের ভাড়া বাড়িতে যথেষ্ট শোওয়া বসার স্থানাভাব হেতু অজয়ের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে ওদের বাড়ির খোলা বারান্দায় শোওয়ার ব্যবস্থা হয়। যাবার আগে অজয়ের বাড়ির লোকেরা সব ঘরের দরজা জানালা তালা বন্ধ করে চলে যান। আমাদেরও একটু বাড়িটার ওপর নজর রাখতে বলেন।

অনেক বড় জায়গার ওপর এখন বাড়িটা শুনশান। রাত্রে মনে হয় যেন প্রেতপুরি। বাড়ি খালি পড়ে থাকায় কয়েক মাসের মধ্যে বাদুড় চামচিকে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। তাদের ডানা ঝটপটানির ও উড়ে চলার আওয়াজ শুনি।

বারান্দায় পূর্ব দিকটায় আম জাম, ডুমুর, কাঁঠাল, পেয়ারা, কলা, নিম ও তেঁতুল গাছ। বাগান সংলগ্ন জায়গায় একদিকে বাগানের মধ্যে লাউমাচা বাঁধা। সাড়ে চার পাঁচফুট উচ্চতায় বেড়ে ওঠা সবুজ ডেঙো গাছের ফলনের ঝোপ। এছাড়া বেশ কয়েকটা নারকেল গাছ দেখা যায়। যেন লোহার গেটের দু-প্রান্তে দীর্ঘাকৃতি ঝাউ গাছ দাঁড়িয়ে।

এক হিন্দুস্থানি দারোয়ান গোটা বাড়িটার নজরদারি আর দেখভালের জন্য বহাল। তার নাম জগদীশ পাণ্ডে। বিহারের পাটনায় বাড়ি। এছাড়া আরও একজন বাগান দেখা শোনা পরিচর্চা করার জন্য মালি নিযুক্ত। তার নাম নিশামণি মহাপাত্র। উড়িষ্যার কটক জেলার কোনও এক গন্ড গ্রামের বাসিন্দা ছিল। এখানে বাবুবাড়ির মালির কাজ পেয়ে সস্ত্রীক দুটি বাচ্চা সহ ও এক বিধবা বোন ফুলমণি বাস করছে বছর দশ বারো। এঁরা সকলেই প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী। অন্ততঃ আমার তাই ধারণা।

আজকাল সন্ধ্যার পর আঁধার নামলে বাড়ি আর বাগানের চারপাশটা কেমন যেন একটা ঘোর রহস্যময় ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। মানুষজন না থাকায় ভূতের বাড়ি বলে মনে হয়। বাড়িটার আর একদিকে একটা পুষ্করিণী আছে। তাতে জল নেই বললেই চলে। অগভীর জলাশয়।

বাগানের দিকটায় সন্ধ্যার পর বড় একটা কেউই যাতায়াত করে না। এমন কী বাগানের মালি নিশামণিও যেতে ভয় পায়। বলে ভূতো অছি। দারোয়ান জগদীশ পাণ্ডে মাঝে মাঝে ভূতাবিষ্ট হয়ে পড়ে। ভয় পেয়ে রাত্রে বাড়ির চারপাশ সেই সময় পাঁচ সেলের টর্চ হাতে নিয়ে আলো ফেলতে ফেলতে আর লাঠি ঢুকতে ঢুকতে পাহারার কাজ সারে কোনমতে। কৌন হ্যায়? কৌন হ্যায়? বলতে বলতে কর্তব্য সমাধা করে গেটের কাছে তার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে নাক ডাকে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে যাবার পর জগদীশদাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি 'রাত্রে এত জোরে জোরে লাঠি ঠোকো কেন? আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। উত্তরে ভয়ার্ত কণ্ঠে জগদীশ বলে 'বড়া কর্তাবাবু রাত্রে ওপরের ছাদে পায়চারি করেন। গিন্নিমার সাথ বাতচিত ভী করেন। হামি কান খুলকর শুনা হ্যায় - ভূত বন্ গয়া। ডর ভীর লাগতা হ্যায়, হাম কেয়া করুঁ! আধা হিন্দি আধা বাংলায় জগদীশ তার কথা শেষ করে রামনাম জপ করতে থাকে।

নিশামণি মহাপাত্র ভূত দেখার কাহিনি শোনায় আমাদের। ওদের

গ্রামে ভূতেদের উৎপাত সবিস্তারে বর্ণনা করে। গ্রাম ছাড়ার কারণ নাকি ভূতেদের জন্য। ভূতের জন্যে নিশামণি পরিবারের ঘরছাড়া গ্রাম ছাড়ার কথা আমার বিশ্বাস হয় না। যাই হোক।

আমার ভূতের গল্প শুনতে ভাল লাগে। আর শোনার পর গা শিরশির করে ওঠে। যতই হোক ভূত তো! অশরীরী প্রেতাত্মা। কেনা ভূতকে ভয় পায়।

আমার বাবা অলোক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। অতীন্দ্রিয় কিছু দেখেছেন। তবে সত্যিকার ভূত বলতে যা বোঝায় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি। তাঁর মতে একমাত্র সিদ্ধ পুরুষরাই ভূত দেখতে সমর্থ। অন্যেরা যা দেখেন বা বলেন তা হয়ত দৃষ্টি ভ্রমবশতঃ।

আমি ভূতের গল্পের বই পড়ে মজা পাই। ভূতেদের ব্যাপার স্যাপার কান্ড কারখানায় অবিশ্বাসী মনে বিস্মিত হই। প্রশ্ন জাগে, সত্যি কী ভূত আছে? আমার সেজদাকে জিজ্ঞাসা করি ভূত আছে কিনা! সেজদার সোজা সাপটা উত্তর। ভূত আছে - আত্মা পরমাত্মা আছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ সম্পর্কিত বই পড়ে সেজদার বদ্ধমূল ধারণা ব্যক্ত করে 'কে বলে ভূত নেই এ পৃথিবীতে? তারা যত্রতত্র ঘোরা ফেরা করে রাত্রি নিশীথে। এদিক সেদিক ঘোরা ফেরা করে। কী খুঁজতে থাকে কে জানে! ভূতেরা অদ্ভুত। 'ভূত বিশ্বাসে অটল সেজদা।

সেদিন সেজদার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। দাদা দেখল এক সাদা ভূত। এল সে হাওয়ায় জামগাছের পাতা নাড়িয়ে। কী ভীষণ অদ্ভুত! কোথা থেকে এল সেই সাদা ভূত। হঠাৎ করে কে জানে!

দাদা আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বলল, 'দেখতে পেয়েছিস ওই সাদা ভূতটাকে?

আমি ছোট ভাই অবাক হয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করি, 'কোথায় ভূত'? দেখতে পেলুম নাতো - তাও আবার দেখতে সাদা! ভূতের কি গায়ের রঙ আছে নাকি দাদা? কখনও শুনিনি তো!

হয় হয়, সাদা কালো হরেক রকম রঙে সেজে আসে। দেখতে পাসনি তাই!' এক গাদা ভূতের বই পড়া দাদার প্রত্যুত্তর। আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে তাকাই দাদার মুখের দিকে।

দাদা আরও জানায় ওই সাদা ভূতটাকে বেশ কয়েকবার গভীর রাত্রিবেলায় দেখেছিল বাগানের ঐ নিমগাছের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করতে। মাথা নীচু করে কিছু যেন খুঁজছে। তারপর একসময় শুকনো পড়ে থাকা পাতা মাড়িয়ে সড় সড় করে না জানি কোথায় মিলিয়ে যায়। ভূতটা বোধহয় কোনো অপঘাতে মরে ছিল। দাদার সেরকমই ধারণা।

দু' তিনদিন যাবৎ রাত্রে আমার আর সেজদার প্রায় সময়েই ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। বাড়ির ছাদ কারও পদশব্দ হতে থাকে। কখন ওরা দ্বিতল বারান্দায় ঘরের দরজায় দমাদম দমাদম শব্দে আমরা সচকিত হয়ে উঠি। কেউ যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে কোন কিছুর ওপর। আমারও বুকে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম আতঙ্কে।

লোহার গেট খোলার আওয়াজ। মোটর গাড়ির আসা যাওয়ার শব্দ। এরপর সব চুপচাপ।

গত কয়েকদিন ধরে ভূত টুত বড় একটা দেখতে পায় নি দাদা। আমাকে ভূত দেখার কোন কথা জানায়নি। কিন্তু অন্য সব ভুতুড়ে কান্ড ঘটতে থাকল। যেমন হঠাৎ কখনও দড়াম করে দরজা খোলার শব্দ! ভারী গোছের কিছু যেন হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ার শব্দ ফোন বেজে যায় কেউ ফোন না ধরায় আপনা হতে থেমে যায়।

ফিসফাস কথাবার্তা রাতের নিস্তব্ধতায় ভেসে আসে। কিন্তু কিছুই আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। কে বা কারা যেন দুদ্দাড় শব্দ করে ছোটাছুটি করছে মিশ্রগতিতে। ওপরতলায় হঠাৎ জানালা খোলার আওয়াজ। দোতলার ঘরে কখনও টিউবের আলো জ্বলে উঠছে আবার নিভছে। রহস্যময় ইঙ্গিতে বহু ঘটনায় আমরা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যাই।

জগদীশ রাতের ডিউটি শেষ করে যথারীতি ঘুমাতে যায়। তারপর আর ওর কোনও সাড়া শব্দ পাই না ইদানীং। 'কৌন হ্যায়' বলে সাবধান সতর্কবানীও শোনা যায় না।

আর একটা কথা বলা হয়নি। অতবড় বাড়িতে অজয়দের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কোনও পোষা কুকুর ছিল না।

কুকুর ছিল অনেকদিন আগে এক 'গ্রে হাউন্ড ডগ'? চেন বাঁধা থাকতো সারাটা দিন। দিনে ও রাতে দুধ পাঁউরুটি, মাংস ভাত খেতো। ছাড়া পেতো নৈশ প্রহরার জন্য রাত দশটার পর। মুক্তির আনন্দে ছোটাছুটি করতো সারা বাড়ি। ওর নাম ছিল জিমি।

আমরা অজয়দের ভাড়াটে ছিলাম। চেনা মানুষদের জিমি কখনও কামড়াতো না। অনেকদিন সিনেমা জলসা দেখে রাত করে বাড়ি ফিরলেও দু-একবার ঘেউ ঘেউ শব্দ তুলে আমাদের চিনতে পেরে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরতে দিতো। প্রভু ভক্ত সারমেয়।

একদিন এক ঘটনা ঘটে যায়। কর্তব্যে অবহেলা বশতঃ দারোয়ান বড় বাড়ির লোহার গেট বন্ধ করেনি সময় মত। সেই অবসরে জিমি বাইরে পেরোবার গেট খোলা পেয়ে পাড়া ঘুরতে বেরোয়। মুক্তির স্বাদ। স্বাধীনতা। জিমি পাড়ার অভ্যন্তরে চলে যায়। ঘেউ

ঘেউ ডাক দিয়ে মানুষজনকে সতর্ক করতে করতে নিজস্ব এলাকা ছেড়ে। জিমির এই ভুল সিদ্ধান্তের পরিণাম ওর জীবনে বিপদ ডেকে আনল।

বাইরের সঙঘবদ্ধ অন্যান্য কুকুর দল জিমিকে আক্রমণ করল। একা জিমি অনেকগুলি পথ কুকুরকে মারাত্মকভাবে জখম করল। তারপর যুদ্ধ বাঁধল প্রাণপণ আত্মরক্ষার্থে। পথ কুকুররা সংখ্যাধিক্যে আরো জড়ো হয়। তীব্র লড়াই চালিয়ে জিমিকে ক্ষতবিক্ষত করলো। দারোয়ান খবর পেয়ে লাঠি নিয়ে কয়েকটা কুকুরকে পেটায়। কিন্তু তাতে জিমির প্রাণ রক্ষা করা গেল না। জিমি মারা গেল। মারা যাবার পর অজয়রা দুঃখে আর কোনো কুকুর পোষ্য রাখে নি। অজয়দের বাড়ি তারপর থেকে কুকুরহীন, নিরাপত্তাহীন, অরক্ষিত অবস্থায়।

জিমির অনুপস্থিতিতে দু-তিনটে পথ কুকুর গেটের বাইরে স্থান করে নিল। তারাই হয়ে উঠল একসময় অজয়দের বাড়ির নৈশ প্রহরী, রক্ষী বাহিনী। অবশ্যই বাইরে থেকে। এদের মধ্যে শীঘ্রই খ্যাত হয়ে পড়ল টাইগার নামে এক কুকুর। টাইগার তার সঙ্গিনী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে ওখানেই সংসার পাতল। বড় বাড়ি থেকে উদ্বৃত্ত খাবারও আসতে লাগল। টাইগারের সন্তান সন্ততিরা হৃষ্টপুষ্ট ডাগর ডোগর হয়ে বেড়ে উঠল।

কিছুদিন আগে থেকে লক্ষ্য করেছি জগদীশের দুই দেশেয়ালি বন্ধু প্রায়শই জগদীশের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত খোস গল্প করতে আসে। গোপনে অনেকক্ষণ ধরে কীসব শলা পরামর্শ কথাবার্তা চালাচালি হয়।

এমনি করে চলতে থাকল বেশ কিছুদিন। কৌতূহলবশতঃ আমি একদিন জগদীশকে জিজ্ঞাসা করায় ও বলেছিল ওরা দুজন তার দেশের বন্ধুলোক। একজনের নাম ক্ষেত্রপ্রসাদ অন্যজনের নাম সুরজ সিং। মাণিকতলার কাছে এক কামরার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। জগদীশের ঠিকানা যোগাড় করে খোঁজখবর নিতে আসে। কিছু কাজ কামের ধান্দায় কলকাতায় আসা। আমি আরও লক্ষ্য করি কখনও সখনও খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে থেকেও যায়। সকালে চা-জলপানি সেরে মাণিকতলায় ফিরে যায়।

গভীর রাত। দাদা আবার শিবের অনুচর দেবযোনি বিশেষের সাক্ষাৎ পেল। আমায় ঘুম থেকে ডেকে তুলে ডাকাডাকি শুরু করল। চোখ কচলাতে কচলাতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে? আবার সেই সাদা ভূত না কী? কই দেখাওতো।

দাদা চুপ করে থাকতে বলল।

ঐ বারান্দার দিকে গেছে একটু আগে - এই পথে ফিরে যেতেও পারে। দাঁড়া, ঐ বোধহয় আসছে! আমি ভয়ে কাঠ হয়ে বলি 'দা-দা সত্যি সাদা ভূত'?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ তো এদিক দিয়েই আসছে। দেখ ভাল করে দেখ। দেখলুম ঘোমটায় ঢাকা মুখ! শুভ্র আবা পরিহীতা একজন নারীমূর্তি তড়িৎ গতিতে আমাদের দেখা মাত্রই আমাদের বাড়ির ওদিকটায় অন্তর্হিত হল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম। ভাবলুম পুনঃদর্শন হওয়ার কথা। নাঃ সেই নারী আর দেখা দিল না সেদিনের মত। অপেক্ষারত হয়ে রইলুম অন্য কোনোদিন যদি তাঁর দেখা পাওয়া যায়। সেই অপেক্ষায় থেকে দাদাকে বললুম 'এখন শুয়ে পড়া যাক্। তেনার দেখা আজকের মত শেষ।

ঘুম তবু এল না। অন্য এক ঘটনায় মনটা আবিষ্ট হয়ে রইল। গেটের বাইরে টাইগার কাহিনীর চিৎকার শোনা গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ। গেট খোলার আওয়াজ পেলুম। কারুর পদশব্দ ধূপধাপ করতে করতে অশ্রুত হয়ে গেল একসময়।

পরদিন সকালে টাইগারের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। কে বা কারা এই নিরাপরাধ কুকুরদের খাবারের সঙ্গে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করেছে। কারা এই নিষ্ঠুর কাজ করল তা জানা গেল না। কী উদ্দেশ্যেই বা এই কুকুর নিধন হল বোধগম্য হল না। এর পিছনে কী রহস্য লুকানো আছে তখনকার মত সবার কাছে ধোঁয়াশা হয়ে রইল। নিশ্চয়ই কুকুরের নৈশ প্রহরা কারো না কারোর গোপন কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল অথবা অপছন্দের কারণে বেচারা সারমেয়দের জীবন হানি ঘটিয়েছে। এটা আন্দাজ করতে কারো অসুবিধা হলো না।

আমি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ডিটেকটিভ বই পড়ে ফেললাম। যদি কিছু রহস্য উদঘাটন হতে পারে যে কোন সূত্র ধরতে পেরে এই আশায়। সূত্র খুঁজতে গিয়ে রহস্যচালে নিজেকে আরো জড়ালাম। সজাগ থাকতাম রাত যত বাড়তে থাকল।

আমরা যেখানে শুয়েছিলুম তার কয়েক গজ দূরে হঠাৎ একটা ঘূর্ণি হাওয়া বইল আচমকা চক্রাকারে। চেয়ে দেখি মাঝারি বয়সের একটা দুধেল সাদা গাই গরু দাঁড়িয়ে পড়ল। অল্পক্ষণ পরেই মাথাটা নীচু করে যেন তাড়িত হয়ে বাগানের পথ ধরে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল। ওদিকের গেটটা খোলই ছিল। দাদা জাগরিত হয়ে ছিল।

দাদা কাঁপা কাঁপা গলায় ভয় পেয়ে অনুচ্চ গলায় আমাকে বলল, 'ওই দেখ! ওই দেখ! গো ভূত! গো ভূত!

আমি বললুম 'সেটা আবার কী?' দাদা বলে ওঠে ওই গরুটা মাসখানেক আগে মরেছিল। এখন ভূত হয়ে চারিদিক ছোটাছুটি করছে! ওদের গো ভূত বলে।'

আমি হতবাক হই। দাদাকে বলি 'গরু ভূত হয় কখনও শুনিনি তো'। আমি পরে এইটুকু জেনেছিলাম অজয়দের দু-তিনটে সাদা গরু ছিল। একটা সাদা গরু যে মারা গিয়েছিল সে সত্য আমার অজানা ছিল।

আর একদিন এক রাতের কথা। বারান্দায় সেদিন শুতে যাই নি বৃষ্টি হওয়ার জন্য। প্রকৃতি নীরব শীতল। আকাশে মেঘদল ভেসে বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষ।

আমাদের ঘরের জানালার কপাট খোলা ছিল। একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল দাদা। আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলল।

শুনতে পেলুম, কে যেন ডাকছে সেজদার নাম ধরে। খুব নীচু স্বরে তিনবার। 'ঋষভ, ঋষভ ঋষভ'! দাদা সে ডাকের কোনও সাড়া দিল না। আবার ডাক শোনা গেল, ঋষভ - ঋষভ - ঋষভ'। আমি দাদাকে চুপিসারে বলি কে যেন ডাকছে তোমার নাম ধরে। দাদা এবারও কোনও সাড়া না দিয়ে আমাকে কানে কানে বলল 'নিশি ডাকছে - নিশিভূত ডাকছে'।

আমি ভীতপ্রায় হয়ে দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললুম 'নিশিডাক! সে আবার কী?'

দাদা আমার মুখ চেপে ধরে ডেকে জাগায়। তারপর সে ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ঘুম থেকে উঠে পড়ে ঘর থেকে নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ে নিশিভূত তখন তাকে বশ করে মেরে তার প্রাণ হরণ করে ডাবের খোলা মুখে ঢাকনা চাপা দিয়ে নিয়ে চলে যা. আরেক মৃত প্রায় মানুষের প্রাণ সঞ্চার করবার জন্য। এঁরা এক ধরণের তান্ত্রিক।"

আমি সভয়ে বলি 'তাই নাকি? কী ভীষণ ব্যাপার! দাদা আমাকে নিরুদ্বিগ্ন করতে বলে, 'তোকে রাত্রে কেউ নাম ধরে ডাকলে কখনও সাড়া দিবি না। বা ঘুম ভেঙে গেলে বাইরে যাবি না। সাবধান!

দাদার সেই সাবধান বানী আজও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকি।

সেদিন যথারীতি অজয়দের লাল বারান্দায় আমি আর দাদা শুয়ে। অন্ধকারে মেঘ জমা হলেও বৃষ্টি না হওয়ায় যথেষ্ট গুমোট গরমে ঘুম আসছিল না। গরমে ছটফট করতে করতে আমরা একসময় উঠে বসি। নানা রকম উপদ্রবে দাদা ও আমি সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকি।

কৃষ্ণপক্ষ তখন শেষ হতে চলেছে। মেঘ-চাঁদ আলোর খেলা দেখছি। ঝিরঝির বাতাস বইতে শুরু করেছে। একটু পরে আবার শুয়ে পড়ি।

ঘুম না আসায় চোখ মেলে ছিলুম। হঠাৎ সেই আলো আঁধারিতে চেয়ে দেখি একটা গোলাকার জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড জ্বলা অবস্থায় বারান্দায় রাস্তার পাশ দিয়ে আমাদের দিকটায় ধেয়ে আসছে দপ্‌দপ করতে করতে। একটু পরে ওই অবস্থায় জ্বলতে জ্বলতে রাতের অন্ধকারে একদিকে মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করলাম।

দাদা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে চেয়ে যখন আলেয়া, আলেয়া ভূত! অনুক্ষণে। কাছে না গেলে কোনও ক্ষতি করে না। ভালো ভূত। ভয় নেই।

বন্ধুদের সাথে গল্প করার এক সময় জেনেছিলাম ইংরেজিতে ওকে বলে 'Willo-The Wise'। যাকে দাদা আলেয়া ভূত বলেছে। ওটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। অজয়দের বাড়ির দক্ষিণ দিকে বেশ খানিকটা অঞ্চল জুড়ে এক জলাশয় আছে। এখন গ্রীষ্মে জল বেশ কিছুটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু তার অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। কারণ জলাভূমি থেকে আলেয়ার উৎপত্তি কিভাবে হয় তখন তা জেনে ফেলেছি। দাদাকে সেকথা জানালুম। আমার কথা শুনে দাদা আমার মুখপানে তাকিয়ে আর কিছু বলল না।

এদিকে ক্ষেত্রপ্রসাদ আর সুরজ সিংয়ের যাতায়াত বেড়েই চলল। জগদীশের প্রশ্রয় পেয়ে ওরা বাড়ির চারদিকে ঘোরাফেরা করে। বাগানে প্রবেশ করে গাছের ফলনে হাত দেয়। আম জাম পেয়ারা পেড়ে নিয়ে যায়। বাজারে সেসব বিক্রি করে।

সেদিন সকালবেলায় নিশামণি মহাপাত্র মুখ কাঁচুমাচু করে এসে জানায় বাগানে অনেক সবজি চুরি হয়ে গেছে। চুরি হয়েছে লাউ, কুমরো, বেগুন, ঝিঙে, কাঁচাকলার কাঁদি - ডেঙো ডাঁটার ডালপাতা, সব উধাও। এমন কী নারকেল গাছের ডাব পেড়ে কারা চুরি করেছে। টেলিফোনের তার কাটা।

এই চুরি যাওয়ার খবর শান্তিপুরের বাড়িতে জানানো হল। শান্তিপুরের শান্তি তাতে বিঘ্নিত হল। অজয়ের বাবা কাকা শান্তিপুর রওয়ানা হবার আগে সাদা পুলিশকে মোতায়েন করার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তাদের হাতে অনেক তথ্য জানতে পারেন অজয়ের বাবা অক্ষয়বাবু ও কাকা বিনোদবাবু।

সাদা পুলিশ আরো নজরকারি বাড়াল। এতে কাজ হল। ক্ষেত্রপ্রসাদ ও সুরজ সিংয়ের আসা যাওয়া কমল। কিন্তু সময় সুযোগ বুঝে সঙ্গোপনে আরো চুরি চামারি হতে থাকল। তিনতলা ঘরের কুঠরি থেকে চুরি হয়েছে বিদেশী খেলনা পুতুল, দামি চিনামাচির পাত্র, ডিনার টেবিলের কাঁটা চামচ, সুদৃশ্য প্লেট, অয়েল পেন্টিং করা ছবি, বাসন পত্র, রুপোর বাতিদান ইত্যাদি।

আগেকার মত আমাদের ভূতের ভয়, বাগান থেকে তরিতরকারির সবজি চুরি, সাদাভূত অচেনা অজানা শব্দ আর আতঙ্ক কমল না কিছুমাত্র।

সাদা পুলিশের লোকেরা বাড়িতে তল্লাশি চালান জরুরি অবস্থার তাগিদে।

মালির ঘর দেখা হল। জগদীশ কিছু অনুমান করে কোথাও বেড়িয়েছিল। সাদা পুলিশ জগদীশের ঘরে অন্বেষণ চাপিয়ে অনেক কিছুর হদিশ পেল। দেখল পোড়া বিড়ি সিগারেটের টুকরো, খালি দেশি মদের বোতল, সন্দেহজনক কাগজপত্র সেই সঙ্গে কাঁচা সবজির বড় কয়েকটা বেতের ঝুড়ি।

জগদীশ খবর পেয়ে হন্তদত্ব হয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে। নির্দোষিতা ঢাকতে ওর কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। আমাদের যে কথা বলে ওর বন্ধুদের পরিচয় দিয়েছিল সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল।

পুলিশরা কোনও সন্দেহভাব না দেখিয়ে অন্যভাবে আড়ি পাততে থাকল। নজরদারি আরো বাড়ল।

জগদীশের বন্ধুদের আসল পরিচয় জানবার জন্য কলকাতার বিভিন্ন সন্দেহজনক অঞ্চলে অনুসরণ পদ্ধতি চালিয়ে অনেক কুকীর্তির নায়কদের তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হল পুলিশ।

ওদিকে অজয়ের অভিভাবকেরা যারপর নাই ক্রুদ্ধ হয়ে শান্তিপুর থেকে ফিরেই জগদীশকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন।

বিশ্বাস ভঙ্গেয় দায়ে অভিযুক্ত হল জগদীশ। পুলিশের জেরা চলতে লাগল জগদীশ ও তার পরিবারের লোকজনের ওপর। মালি নিশামণিও রেহাই পেল না পুলিশের জেরা থেকে। তবে চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হল না তখনকার মত।

পুলিশ নিষিদ্ধ স্মাগলিং কারবারের সন্ধান পেল একাধিক সূত্র অবলম্বন করে। গাঁজা, আফিম, কোকেন, হেরোয়িন, সোনার বিস্কুট বার আর বিদেশী মদ। গোপন চোরা চালানের হদিশ ও মিলল।

এবার আর একটা ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। দলবল সহ ধরা পড়বার মুখেই জগদীশের গলায় দড়ি দেওয়ার ঘটনা ঘটল। ঘরের সিলিং ফ্যানে জগদীশের মৃতদেহ ঝুলতে দেখা গেল। জগদীশ আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ বডি তুলে নিয়ে গেল পোষ্টমর্টেম করবার জন্যে।

আমি আর দাদা ভয়ে জড়সড় হয়ে সকলবৃত্তান্ত জানাই। এমন কী সাদাভূত দেখার কাহিনী, ভূতের উৎপাত, ক্ষেত্রপ্রসাদ সুরজ সিংয়ের যাতায়াত।

সাদা ভূতের কথায় অক্ষয়ের বাবা কাকারা কাকতালীয় ব্যাপারে বলে জেগে উড়িয়ে দিলেন। একটা গরু চুরির কথা অস্বীকার করতে পারলেন না।

নিশামণির বিধবা বোন ফুলমণি রাতের দিকে পারতপক্ষে রাত্রিরই ঐ সময়টায় বড় বাইরে করতে সাদা জামা কাপড় পরতো সেকথাও জানা গেল।

আলোয়ার আলো দেখাকে কেউই অবিশ্বাস করেন নি। ভীম বাদুড় চামচিকের উৎপাত বন্ধ হল। এরই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রপ্রসাদ সুরজ সিংয়ের দলবল সহ সবাই পাকড়াও হয়ে অতঃপর শ্রীঘরে।

এতসব ঘটনা ঘটেযাবার পরেও আমার সেজদা ভূত না থাকার কথা বিশ্বাস করেনি। কেন কে জানে। হয়তো বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

****

সংঘ বার্তা

১৪২১ বঙ্গাব্দের প্রথম উৎসব নববর্ষ বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দের সাথে পালিত হয় নয়ডা কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে। দিনে বিশেষ পূজা ও সন্ধ্যায় বিশেষ আরতি হয় মা কালীর মন্দিরে। সন্ধ্যা আরতির পর শুরু হয় বাংলা ছায়াছবির প্রদর্শনী "হেমলক সোসাইটি"। ছায়াছবির শেষে উপস্থিত সভ্য, সভ্যা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা একত্রে আহার গ্রহণ করেন।

অবশ্য নতুন কার্যকারী সমিতি কার্যভার গ্রহণ করার সাথেই উদ্‌যাপিত হয় বাসন্তী পূজা । বেশ কয়েক বৎসর ধরে কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারে বাসন্তী পূজায় লোক তথা ভক্ত সমাগম ছিল অন্য বৎসরগুলির তুলনায় বেশ বেশি। তার প্রধান কারণ, নিয়মিত পূজা ও ভোগ বিতরণ ছাড়া ছিল সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তিন দিনের এই পূজার প্রথম সন্ধ্যায়

ছিল স্থানীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠান। সেগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ছাড়াও লোকসঙ্গীতও ছিল প্রচুর। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল কলকাতা থেকে আগত শিল্পী ঋতুপর্ণা ব্যানার্জীর সঙ্গীতানুষ্ঠান। শিল্পীর পরিবেশনা ও কুশলতা প্রশংসার যোগ্য। তৃতীয় সন্ধ্যায় ছিল World Cup-T20 Final খেলার Live Telecast. বাসন্তী পূজা নয়ডার প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান অথবা উৎসবের স্থান নিয়েছে। ১০ই মে ২০১৪ শনিবার অনুষ্ঠিত হয় নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশনের বাৎসরিক উৎসব। ঐদিন নয়ডার বিভিন্ন সেক্টরের সাংস্কৃতিক শিল্পীরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আকারের অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন এবং দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দান করেন।

১১ই মে রবিবার সকাল ৬.৩০ মিঃ শুরু হয় কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান। প্রথা অনুসারে "হে নতুন" সঙ্গীতের মাধ্যমে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রায় ৭০ জন ছোট ও বয়স্ক শিল্পী কবিগুরুর গান ও আবৃত্তি করে অনুষ্ঠানকে সাফাল্যমণ্ডিত করেন। শিল্পীদের মধ্যে শ্রী প্রদীপ্ত দত্ত, শ্রী বিপ্লব দাশগুপ্ত , শ্রীতুষার চৌধুরী, দেবারতি মুখার্জি, মালঞ্চ চক্রবর্তী এবং বোধিসত্ত্ব ব্যানার্জী উল্লেখনীয়। সাহানা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় কালীবাড়ী শিশুশিল্পীরাও যথেষ্ট মনে রাখার মত।

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশন গত দু বছর বার্ষিক নাট্যউৎসবের আয়োজন করছে।

এ বছর নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৩১শে মে এবং ১লা জুন, ২০১৪। শনি ও রবিবার কৃভকো মঞ্চে। ৩১শে মে শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হয় নাটক 'পুতুলখেলা'। প্রযোজনা - স্বপ্ন এখন, দিল্লী। পরিচালনা - শ্রী শমীক রায়। দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাটক 'শেষরক্ষা'। পরিবেশনা - গ্রীণরুম থিয়েটার, দিল্লী। পরিচালনা শ্রী অঞ্জন কাঞ্জিলাল।

মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদবোধন করেন সমিতির প্রবীন সদস্য শ্রী সুখেন্দী চ্যাটার্জী এবং শ্রী সমীর ঘোষ।

সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক দু বছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে সমিতির কার্যকারী সমিতি পরিবর্তিত হয়।

এ বছর গত মার্চ মাসে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কার্যকারী সমিতি নির্বাচিত হয়। ১লা এপ্রিল ২০১৪ নবনির্বাচিত কমিটি কার্যভার গ্রহণ করে। কার্যকারী সমিতির সভ্যদের তালিকা নিম্নরূপ :

সভাপতি - শ্রী অনিল কুমার সাহা -
সহ-সভাপতি - শ্রী নিলাদ্রী দুয়ারী, শ্রী রজত ব্যানার্জী
সম্পাদক - শ্রী অমিয় দাস
কোষাধ্যক্ষ - শ্রী তাপস রঞ্জন পাল,
কার্যকারী সভ্য - শ্রী চঞ্চল গাঙ্গুলি , শ্রী জহরলাল দে,
শ্রী মলয় ভট্টাচার্য, শ্রী সনৎ চক্রবর্তী,
শ্রী শান্তনু মন্ডল , শ্রী সাত্যকী গুহ
শ্রী আশীস ভট্টাচার্য, শ্রী কৃষ্ণেন্দু ঘোষ

বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন পরিবেশিত নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রী অনিল কুমার সাহা-সভাপতি, শ্রী সুখেন্দু চ্যাটার্জী -প্রধান অতিথিএবং শ্রী প্রদীপ দত্ত - আহ্বায়ক ।

নাট্যোৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রী নিলাদ্রী দুয়ারী, শ্রী অমিয় দাস, শ্রী রজত ব্যানার্জী, শ্রী সুখেন্দু চ্যাটার্জী, শ্রী সমীর ঘোষ এবং শ্রী জহর লাল দে ।

"গ্রীনরুম থিয়েটার্স" পরিবেশিত "শেষরক্ষা" নাটকের একটি দৃশ্য

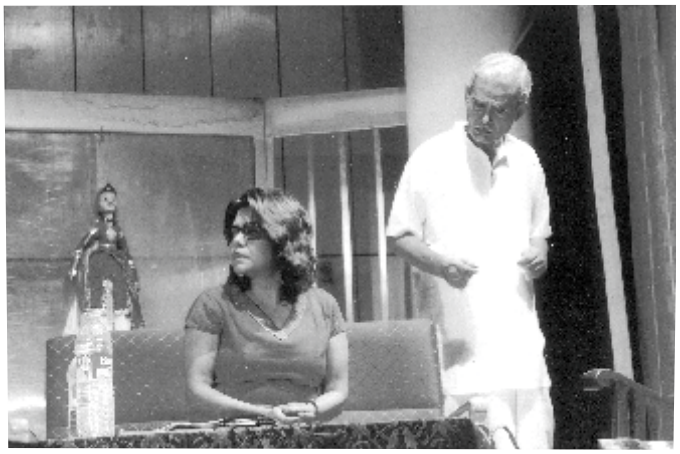

"স্বপ্ন এখন" পরিবেশিত "পুতুল খেলা" নাটকের একটি দৃশ্য

পাত্র চাই

পাত্রী - শ্রীমতি পল্লভী দাস, পিতা - শ্রীযুক্ত ইউ. এস. দাস বয়স ২৯ বৎসর (৬ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪), উচ্চতা - ৫ ফুট , নরগণ, শিক্ষা - বি.কম, পি.জি.ডি.পি.এম (HR), I.T. Company-র সাথে যুক্ত।
যোগাযোগের ঠিকানা
Mayur Vihar, Phase-III, Delhi-110096
টেলিফোন ঃ 09899467177, 09958553698

পাত্র চাই

পাত্রী ঃ শ্রীমতি মৌমি দাস বয়স ঃ ২৬ বৎসর (৫ই নভেম্বর, ১৯৮৭), উচ্চতা ঃ ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, রঙ ঃ উজ্জ্বল, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ M.Sc. (Biotechnology), Persuing Ph.D. in Human Genetics, গোত্র ঃ গর্গ মহর্ষি, বর্ণ ঃ বারুইজীবি (অন্য বর্ণে বাধা নেই), পিতার নাম ঃ শ্রীযুক্ত সুধীর কান্তি দাস, টেলিফোন ঃ 8447090309

পাত্র চাই

আলম্যান গোত্র, অ-ব্রাহ্মন কুণ্ডু, ৩০ বৎসর (জন্ম ১৯৮৩), উচ্চতা ৫ ফুট, B.A., LLB, C. University, Schooling at Eng. Med., Advocate, Supreme Court of India, New Delhi - পাত্রীর সুযোগ্য পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন ঃ 09811192770, 09748886507, 01204255523

পাত্র চাই

বৈশ্য সাহা পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়স ঃ ৩১ বছর, উচ্চতা ঃ ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ BA, MBA, দিল্লিতে বসবাসকারী সম্ভ্রান্ত পরিবার। টেলিফোন ঃ 9560573322

পাত্রী চাই

আত্রেয়(কায়স্থ), ৩০ বৎসর, B.Com, MBA, বেসরকারী সংস্থানে কর্মরত মাসিক আয় ২০,০০০ টাকা পাত্রের সুযোগ্য পাত্রী চাই । পিতা - বাঙালি, NTPC-তে কর্মরত as AGM, মাতা - তামিল বংশীয়
ঠিকানা ঃ P-241, Sector-21, Jalbayu Vihar, Noida
Ph : 9650993348

সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী বন্ধুরা নীচের ঠিকানায় লেখা পাঠান :

সম্পাদক
সমন্বয়
নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
ই৫ সি, কালীবাড়ী মার্গ, সেক্টর ২৬
নয়ডা ২০১৩০১
ফোন ০১২০- ২৫২২৮৩৬ / ৪৫৪৭৩৭৫

Published by Amiya Das, Secretary,Noida Bengali Cultural Association and printed by Delhi Paper Products.